ভূমিকম্পের ভেতর বাহির

ভূ-অভ্যন্তরের চুপচাপ, শান্ত মাটি বলা নেই-কওয়া নেই হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে বসলেই সর্বনাশ। মুহূর্তেই প্রবল এক ঝাঁকুনিতে দালানকোঠা-গাছপালা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। বিপুল পরিমাণ শক্তির আকস্মিক নির্গমনের কারণে 'সিসমিক ওয়েভ' নামের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তারই বহিঃপ্রকাশ এই ভূমিকম্প।

সিসমোমিটার বা সিসমোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্য ভূমিকম্প মাপা হয়। মাত্রাটি প্রকাশ করা হয় রিখটার স্কেলে। সেই স্কেল অনুযায়ী, ৩ বা এর কম মাত্রার ভূমিকম্পকে নিরাপদ এবং ৭ বা এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্পকে খুবই বিপজ্জনক হিসেবে ধরা হয়। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৯ দশমিক ৫। ১৯৬০ সালের ২২ মে চিলিতে হয়েছিল ওই কম্পন। সম্প্রতি জাপানে সংঘটিত ৯ মাত্রার ভূমিকম্পটিকে জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক এবং পৃথিবীর ইতিহাসে ষষ্ঠ শক্তিশালী ভূমিকম্প হিসেবে ধরা হচ্ছে।

ভূমিকম্পের কারণে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার প্রাবল্য মাপা হয় মারকেলি স্কেলে। ভূমিকম্পের গভীরতা যত কম হবে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ততটাই বেড়ে যাবে। ভূমিকম্প তার ক্ষণিকের উপস্থিতি বেশ ঘটা করেই জানান দিয়ে যায়। ভূমিকম্পের সময় মাটির বুকে চিড় কিংবা খাদ, কখনোবা ভূমিধস এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও দেখা দিতে পারে। সমুদ্রতলের মাটি সরে গিয়ে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ সুনামি, ঠিক যেমনটি হয়েছে জাপানে।

উৎস

পৃথিবীর গভীরে কিছু এলাকা আছে, যেগুলো মাত্রাতিরিক্ত ভূমিকম্পপ্রবণ। এসব এলাকা 'ফল্টলাইন' নামে পরিচিত। এসব এলাকায় ফাটল ধরার কারণে সৃষ্টি হয় বিধ্বংসী ভূমিকম্পের। ফল্টলাইন তিন ধরনের–সাধারণ, উল্টো এবং ঘর্ষণ বিচ্যুতি। ভূ-অভ্যন্তরের কঠিন দুটো স্তরের মাঝে বিচ্যুতি ঘটলে হয় সাধারণ ফল্ট, দুটো স্তর সংকুচিত হলে ঘটে রিভার্স তথা উল্টো ফল্ট, আর পাশাপাশি সরে গেলে ঘটে স্ট্রাইক স্লিপ তথা ঘর্ষণ বিচ্যুতি।

এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস ও খনিতে বিস্ফোরণের কারণে ভূমিকম্প হতে পারে।

মাটির নিচে প্রথম যেখানে ফাটল দেখা দেয়, সেটাকে বলা হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা হাইপোসেন্টার। আর এর ঠিক ওপরে পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশটিকে বলা হয় এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র। অনেক সময় একটি বড় ভূমিকম্প আঘাত হানার পর ছোট আকারের বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প পরপর আঘাত হানতে পারে। বড় আকারের ভূমিকম্পটি মেইন-শক, আর ছোট আকারের কম্পনগুলোকে বলা হয় আফটার-শক।

পরিণতি

মাত্রা ছাড়ানো ভূমিকম্পের আক্রোশের সর্বশেষ শিকার জাপান। সুনামি, বাড়িঘর ধ্বংস, মানুষের মৃত্যু এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিপর্যয় তো আছেই, সেই সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যুক্ত হয়েছে নিউক্লীয় চুল্লির বিস্ফোরণ। শুধু তাই-ই নয়, এই ভূমিকম্পের কারণে কোস্টলাইন তথা উপকূলীয় রেখাও সরে গেছে বেশ খানিকটা। সেই সঙ্গে সরে গেছে পৃথিবীর অক্ষরেখাও।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে-তে কর্মরত পদার্থবিদ কেনেথ হাডনাট সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই ভূমিকম্পের কারণে জাপানের বেশ কিছু জায়গার মাটি আড়াই মিটারের মতো সরে গেছে। বিশেষজ্ঞরা জানান, সমুদ্রের নিচে মাটি সরে যাওয়ায় পৃথিবী তার অক্ষরেখা থেকে কমপক্ষে ৮ সেন্টিমিটার সরে গেছে। এর ফলে কমে গেছে দিনের দৈর্ঘ্য। পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশের ঘূর্ণনের গতি বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। আর অক্ষরেখার আগের জায়গা থেকে সরে যাওয়াই এই গতি বেড়ে যাওয়ার কারণ।

২০০৪ সালের সুনামিতেও পৃথিবীর অক্ষরেখা প্রায় ৩ ইঞ্চি সরে গিয়েছিল। দিনের দৈর্ঘ্যে পরিবর্তন ঘটে ৬ দশমিক ৮ মাইক্রোসেকেন্ড (১ মাইক্রোসেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের ১০ লাখ ভাগের এক ভাগ)। ২০১০ সালে চিলির ভূমিকম্পে পৃথিবীর অক্ষরেখা সরে যায় ৩ ইঞ্চি। তাতে দিনের দৈর্ঘ্য কমেছিল ১ দশমিক ২৬ মাইক্রোসেকেন্ড। ২০১১ সালের ভূমিকম্প ও সুনামিতে জাপানের প্রধান দ্বীপ হনশু সরে গেছে ৮ ফুট। ২০০৪ সালের সুনামিতেও সরে গিয়েছিল কিছু দ্বীপ। সুমাত্রার কয়েকটি দ্বীপ তো ২০ মিটার পর্যন্ত সরে গিয়েছিল।

○ ফাহমিদা হক

[কালের কণ্ঠ, ২২ মার্চ ২০১১]

রিখাটার স্কেল	শক্তি (টিএনটি)	প্রভাব	কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে	সংঘটনের সম্ভাব্য সংখ্যা
০১	৪৭৬ গ্রাম	কম্পন টের পাওয়া যাবে না।	গ্রেনেড বিস্ফোরণ	দিনে ৮ হাজার
০২	১৫ কিলোগ্রাম	কম্পন টের পাওয়া যাবে না। তবে রেকর্ড করা হয়।	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমা	দিনে ১ হাজার
০৩	৪৭৬ কিলোগ্রাম	প্রায়ই অনুভূত হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতি হয় না।	চেরনোবিল দুর্ঘটনা (৩.৫)	বছরে ৪৯ হাজার
০৪	১৫ মেট্রিক টন	ঘরের দরজা জানালা কাঁপবে, তবে খুব একটা ক্ষতি হবে না।	অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ	বছরে ৬ হাজার ২শ
০৫	৪৭৬ মেট্রিক টন	পুরনো ভবন ধসে পড়তে পারে।	লিংকনশায়ার ভূমিকম্প (২০০৮)	বছরে ৮শ
০৬	১৫ কিলোটন	১৬০ কিলোমিটার জুড়ে ধ্বংস হতে পারে।	নাগাসাকির অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ	বছরে ১২০
০৭	৪৭৬ কিলোটন	আরো অনেক পরিসরে ধ্বংস।	ইন্দোনেশিয়ার জাভা (২০০৯) ও হাইতির ভূমিকম্প (২০১০)	বছরে ১৮
০৮	১৫ মেগাটন	কয়েক শ কিলোমিটার জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে।	সান জুয়ান ভূমিকম্প আর্জেন্টিনা (১৮৯৪)	বছরে একবার
০৯	৪৭৬ মেগাটন	কয়েক হাজার কিলোমিটার গুড়িয়ে দিতে পারে।	লিসবন ভূমিকম্প (১৭৫৫) জাপান (২০১১)	২০ বছরে এক বার